আচার্যর কবিতা: একটি অসম্পূর্ণ পাঠ

গৌতম মণ্ডল

আমি যখন কবিতা লিখতে শুরু করি, ১৯৯২-৯৩ নাগাদ, সেসময়, বলতে লজ্জা নেই, দেবদাস আচার্যর কবিতা পড়া তো দূরের কথা, আমি তাঁর নামই জানতাম না। ১৯৯৫ সাল নাগাদ আমার হাতে একটা বই এসে পৌঁছায়। 'মৃৎশকট'। খসখসে নিউজ পেপারে ছাপা সে বই। দেবদাস আচার্যর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটি পড়ে, বলাই বাহুল্য, আমি অভিভূত হই। তবে, মনে পড়ছে, সেসময় সবচাইতে অভিভূত হয়েছিলাম এর প্রবেশক গদ্যটি পাঠ করে। দেবদাস আচার্যর কবিতায় প্রবেশ করার আগে সেই প্রবেশকটির অংশবিশেষ আরেকবার পড়ে নেব।

> ধরা যাক সূর্যের রশ্মি পৃথিবীর মাটি স্পর্শ না করে পাঁচ হাত ওপরে এসে থেমে গেল, মাটি ছুঁতে পারল না, তখন হইহই করে সংগ্রাম শুরু হয়ে যাবেই, এবং জীবনধারণের জন্যে ঘাস ও গুল্মলতাকে বাধ্য হয়েই তাতে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং তাদের প্রত্যেককে পাঁচ হাত লম্বা হতেই হবে।

সত্যিই তো, এরকম যদি হয়, অর্থাৎ সূর্যের রশ্মি যদি পাঁচ হাত উপরে এসে থেমে যায়, তাহলে কী হবে? পৃথিবী কি ধ্বংস হবে? এরকম ভাবনা তো কোনোদিন ভাবিনি। অভিনব ভাবনা। এইরকম ভাবনা যিনি ভাবতে পারেন তিনি যে একজন মৌলিক কবি হবেন এবং তাঁর কবিতা যে আর পাঁচজনের চেয়ে আলাদা হবে, এটা বুঝতে, সে বয়সেও আমার কোনো অসুবিধে হয়নি, হওয়ার কথাও নয়। আমার দীর্ঘ দিন ধরে ধারণা ছিল, 'মৃৎশকট' কাব্যগ্রন্থেই দেবদাস আচার্য একটা নিজস্বতা খুঁজে পান। নিজস্ব ভাষা। ডিকসন। কিন্তু দেবদাস আচার্যকে নতুন করে পড়তে গিয়ে এখন আমার মনে হচ্ছে, 'মৃৎশকট' নয়, তার আগেই, প্রথম বই 'কালক্রম ও প্রতিধ্বনি'তেই তিনি অর্জন করতে পেরেছিলেন একটা নিজস্বতা। নিজস্ব জগৎ। বাংলা কবিতা যে জগতের কথা এতদিন বলতে চায়নি, বলেনি, শ্রমজীবী মানুষের সেই কর্কশ জগৎ, তিনি তা কবিতায় অবলীলায় ধারণ করলেন, লিখলেন। কেমন সেই কর্কশ জগৎ, আসুন, প্রত্যক্ষ করি:

> সে নিড়িনি চালায় শস্যে, বিদে দেয়, খুঁটে তোলে আগাছা
> সে কাজললতার মতো মেঘ দেখলে খুঁট থেকে বিড়ি বার করে
> সে আলাপসালাপ করে ফসলের ভবিষ্যৎ নিয়ে
> মাতব্বরের কাছে যায় ফসলের স্বাস্থ্যের জ্ঞান নিতে
> ফসলের অসুখবিসুখে সে হত্যে দেয় বুড়োবাবার থানে
> তার স্যাঁৎলা-ধরা বোকড়া দাঁত ঝিলকে ওঠে হাসিতে
> যখন রেণু নিয়ে খেলা করে বাতাস।
>
> সে পাখি তাড়ায় লাঠি দিয়ে, ইঁদুর মারার কল পাতে

ফসলের জন্যে সে বয়ে আনে খাবারদাবার
ফসলের জন্যে সে বয়ে আনে ওষুধপত্তর
ফুলটুসি মেয়ের মতো খেতটাকে সাজায় দু-হাতে
তার নাওয়া-খাওয়া নেই,
তার কুটুম্বিতে নেই।

এক সানকি পান্তা আনে মেয়ে তার গামছা দিয়ে বেঁধে
ঠিলেয় করে জল, সরায় করে কাছিমের ডিম
সে মধু ভাঙে গাছ থেকে, মধু দিয়ে পান্তাভাত খায়
সে পান্তা খায় আর হুলুই দেয় গোরু-বাছুর দেখে
তার মেয়ের নাকছাবির মতো ফসল রমরম করে।
তার মেয়ের শরীর বাড়ে লাউডগার মতো
মেয়ে তোলে বুনোআলু, সে তাড়ায় পাখি
তার বৌ কুড়োয় কাঠকুটো, সে তাড়ায় পাখি
তার বৌ যায় গাব পাড়তে, ছেলে চরায় ছাগল
তার ছেলে যায় মাছ ধরতে, সে বিত্তি বুনে দেয়
তার মেয়ের আছে কুড়ুই ব্রত, বৌয়ের আছে শেত্‌লাপুজো
সে গায় বোলান, ছেলে সখের যাত্রা করে
তার মেয়ের দেহের মতো ফসল গড়ে ওঠে মাঠে।

সে নিড়িনি চালায় শস্যে, বিদে দেয়, খুঁটে তোলে আগাছা

সে যায় মাঠে যখন কাকপক্ষী ওঠে
সে যায় মাঠে, তার বৌ ঢেঁকিতে ধান কোটে
সে যায় হাট করতে কালান্তরে, বৌ যায় খুদ ভাজতে
যখন মোষের শরীর ছুঁয়ে সারামাঠে অন্ধকার নামে
সে ফেরে বাড়ি মোষের পিঠে চেপে।

সে বিদে দেয় মাঠে, আর ফসল ডাঁসা হলে
কাকতাড়ুয়া পুঁতে দেয়, গোরুর খুলি ঝুলিয়ে দেয় খেতে
সে পগার কেটে জল আনে গেঁড়েগর্ত থেকে
তার মেয়ের মতো ঘাগরা দুলিয়ে ফসল খেলা করে
তার বৌয়ের মতো অভিমানে ফসল ঢলে পড়ে
আলের ওপর দৌড়োয় সে বনবিড়ালের মতো
সে নিড়িনি চালায় শস্যে বিদে দেয় ...

—সে নিড়িনি চালায় শস্যে

কবিতাটির পাঠ করলেই বোঝা যাবে দেবদাস আচার্য কবিতাকে ড্রয়িংরুম থেকে, রুমের সফিসটিকেশন থেকে নিয়ে আনতে চাইছেন একেবারে মাঠে, সেই মাঠ, যেখানে প্রান্তিক মানুষ 'নিড়িনি চালায় শস্যে' আর 'খুঁট থেকে বিড়ি বার করে' এবং 'মধু দিয়ে পান্তাভাত খায়'। কিন্তু কবিতাটিতে শুধু প্রান্তিক মানুষের অসহায়তার কথা আছে, তা নয়, আছে তাঁর বৌয়ের কথা, ছেলে ও মেয়ের প্রসঙ্গও। কবিতায় সময়ের চিহ্ন সরাসরি এলে তা অনেক সময় স্লোগানে পরিণত হয় কিন্তু এ কবিতা কোনোভাবেই স্লোগান নয়। কবিতাটির সার্থকতা ও অভিনবত্ব এখানেই। শুধু বিষয়েই যে কবিতাটি অভিনব, তা নয়, আমরা যদি কবির শব্দপ্রয়োগ লক্ষ করি তাহলেও দেখব, তিনি তাঁর কবিতায় এমন সব শব্দ ব্যবহার করছেন যা ইতিপূর্বে বাংলা কবিতায় কখনো ব্যবহৃত হয়নি। 'নিড়িনি', 'স্যাঁৎলা ধরা বোকড়া দাঁত' কিংবা 'এক সানকি পান্তা' এগুলো কি আমরা বাংলা কবিতায় দেখেছি? পেয়েছি 'পগার', 'শেতলা পুজো', 'হুলুই', 'ঠিলেয়', 'নাওয়া-খাওয়া' বা 'কুড়ুই ব্রতে'র মতো একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে থাকা শব্দ? সম্ভবত পাইনি। আসলে সম্ভবত শুরু থেকেই দেবদাস আচার্য নিঃশব্দে একটা জেহাদ ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন। এই জেহাদ, বলাই বাহুল্য, প্রথাগত ভাষার বিরুদ্ধে। ভাবালুতার বিরুদ্ধেও। ভাবালুতা থাকবেই বা কীভাবে? দেবদাস আচার্য নিজে একজন উদ্বাস্তু, দেশত্যাগ করে নিরন্ন অবস্থায় বড় হয়েছেন আরেক দেশে। তাঁর বেড়ে ওঠার চারপাশে তিনি সঙ্গী হিসেবে যাঁদের পেয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই প্রান্তিক মানুষ। তাই হয়ত তাঁর কবিতায় ঘুরে ফিরে এসেছে, নান্দনিক চিত্রকল্প নয়, প্রান্তিক মানুষেরা। সাবঅল্টার্ন জগৎ। 'জেগে ওঠো উৎক্ষেপক' কবিতায়, দেখব সেই জগৎ। কবির জেহাদ।

নাহ্
আমার ঠিকানায় কোনো নান্দনিক চিত্রকল্প নেই
নেই কোনো ভিমরুলের মতো বোঁ-বোঁ উড্ডয়ন নিগূঢ় কল্পনা, নেই
শব্দ, শব্দেরও অতীত শব্দ রহস্যের অন্তর্জালচ্ছদ ও মিহি প্রতিঘাতময়
দিনরাত যাপনের ঐহিক ফলার্থ মোহ, কবিতার দরজায় উপাসনা
কিংবা কোনো পিদিম ও তুলসীমঞ্চ সরল সুঠাম প্রণালী
নেই শস্যে উপচে-পড়া গোলা, খেত, খেতের মোহন হাতছানি
কাস্তে হাতে বসে আছি, নয়নজুলির জলে ঘোলামুখ
মাথাল ও নেংটি সার
যোজনায় ঘোষিত বেকার
জমা ও খরচে পুণ্য গণনার অতিরেক, ছাপোষা অচ্ছুৎ
গণতন্ত্রের ঘট পূর্ণ করি ফি-সন দেদার
আধপেট শূন্য পেট
হা-ভাত
এবং আমার বুক হা-হা করে খুন হয়
ঘুমে জাগরণে
একটি দামামা দাও একটি দামামা

—জেগে ওঠো উৎক্ষেপক

প্রান্তিক মানুষেরা তাঁর 'কালক্রম ও প্রতিধ্বনি' কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় কীভাবে ঘুরেফিরে আসছে, আসুন, দেখি আরেকবার:

২

সেই রামরসায়নে ফেরা যাক সেইসব একান্ত অন্তরা
হালদারপাড়ার টুসুপুজো গাবতলায়
সেবার পুজোয় খুব যাত্রা হল, আমি হলাম সঙ
হালদারপাড়ায় আমার নামডাক হল
তাদের গলুইয়ে চিৎ ভেসে যেতাম বিপরীত স্রোতে
আমার স্যাঙ্গাৎ হল গাবু, যে দু-হাতে বেড়জাল ঢালত খালে
সাঁকোর আড়ালে এসে ও বলত, তুই কিছু শিখেনে আমার ঠিঙে

এই জাল ছোঁড়া
এবং আমাকে তোর সঙের পোশাকগুলো দিবি
আমি বলতাম কেন এই আহ্লাদ মশায়
সে বলত হৃদয় হৃদয়
আমি তাকে সঙের নিগূঢ়তা শেখাইনি কখনও
অথচ নিয়েছি বহু, তার দেওয়া জলজ সম্পদ, বিচিত্র খেলনা

নীল ধোঁয়া

৪

আল ভেঙে নেমে আসে জলের তোড়, জল কেটে কেটে
ভেসে আসে নিকিরিপাড়ার ঢোল, বাঁশি
সুরের সপ্তগ্রাম বাতাসে বাতাসে মাখামাখি
আল ভেঙে নেমে আসে, যেমন ছায়ারা আসে সঙ্গী হয়ে
আল ভেঙে নামে জল যেমন স্মৃতির দরোজা খুলে যায়
নিকিরিপাড়ার মহোৎসবে আছি, ছায়ার মতন সঙ্গী হয়ে
স্মৃতির মতন ঐ বিমূর্ত কলরব কীই-বা আর আছে
নিকিরিপাড়ার পাশে ভিত খসা মন্দিরের দেহ ছুঁয়ে ডোমপাড়া
স্মৃতির মতন ব্যক্তিগতভাবে ডোমদুলে হাড়ের কারবারি
একদিন তাদের আমি রামায়ণ শুনিয়েছিলাম
একদিন তাদের চোখের জল উপহার পেয়ে ঝুলি পূর্ণ করেছি
নিকিরিপাড়ার ঢোল আমার রক্তের মধ্যে টগবগ বাজে
আল ভেঙে নামে জল, আমি উজান চেয়েছি টপকে যেতে।

৬

চৈত্রের গাজনে আমি লেংটি-পরা শিব সাজলাম
বোলান যাত্রায় আমি হলাম রামভক্ত সুগ্রীব

তেজপাতাগাছের নিচে মাসিমার ইতুপুজো হত
বাবুদের নাটশালায় ঢপের আসর বসত সারারাতজুড়ে
পুষ্টিহীন বন্ধুদের সঙ্গে আমি হাবড়ে ধরতাম শোলপোনা
এদিকে চৈত্রের মাঠ চেটে খায় ঝুলন্ত সূর্যের জিভ
এদিকে আজানধ্বনি ভেসে আসে বুক বরাবর
আমিও পোশাক খুলে নেমে যাই এইসব পরিপূর্ণতায়
যেভাবে স্রোতের জলে ভেসে যায় টোপাপানা
সেভাবে বয়স হয়, বয়সের অগ্রজ বিভ্রম হয়, আপাদমস্তক
গড়ে উঠি, যেভাবে ঘুঘুরা টা-টা শব্দে শূন্যতা উগলায়
যেমন অশ্বত্থগাছ ঘেরাটোপে আগলাই ত্রিকাল
নীলকুঠির ফার্ন ছুঁয়ে প্রপিতামহের শৈশব জেগে থাকে
বাবুইবাসার মতো আমাদের অচেতন শিল্পে চলে আসে
ভেলভেটপোকার মতো আমি গুড়ি গুড়ি সেই শিল্পের ভিতর
এইসব মরমিয়া কথা আজ তল্পিবাহকের।
বাথানে ছাগল ভেড়া ফিরে আসে, রাখাল উড়ায় গামছা
গোরুমহিষের পায়ে ভেঙে ভেঙে ধুলো হয়ে সন্ধ্যা নেমে আসে
খাড়াই তালের বনে লটকে থাকে সীমান্তের শেষ কারুকাজ
ছাতিমগাছের মতো, ছাতিমফুলের মতো একাকীত্বে ফিরে আসে চাঁদ
নীলকুঠি, কালভার্ট এবং দূরের বাংলো
চোখ মুছে চেয়ে দেখে এই বাংলা এই বাংলাদেশ
সঁকোর ওপর মৃদু পতনের শব্দ করে শৃগাল কাঁকড়া চিবোয়,
সেরকম চিবুতে হয় আমাদের ফেলে যাওয়া বয়সের গিঁট

—আমার জলের পোকা

কবিতাকীর্ণগুলির প্রায় প্রতিটি শব্দেই আমরা পেলাম শ্রমজীবী মানুষের কথা। প্রান্তিক জনপদেরও কথা। কিন্তু শুধু কি এই? 'কালক্রম ও প্রতিধ্বনি' কাব্যগ্রন্থে আমরা দেখতে পাই উত্তাল সত্তর দশককেও। সত্তর দশকের স্বপ্ন। স্বপ্নভঙ্গও। গেরিলাদের ছায়া কীভাবে কবিতায় প্রলম্বিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, আসুন, একবার দেখে নিই।

তখন গামবুট পায়ে বিপ্লবী গেরিলার মতো মেঘ নেমে আসে
পৃথিবীর খুব কাছে, প্রায় প্রতিটি ঘরের দরজায়
তখন ভূলোকের বুকের লোমে হাওয়া লাগে
তখন রিলিফ ম্যাপের ওপর দিয়ে স্টিমরোলারের মতো
গামবুট পায়ে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ির মতো ঘণ্টা নেড়ে
চারদিক থেকে ক্রলিং ... এক ... দো ... তিন ...
সাধারণ লোকটিও ছুটে যায় ভাঁড়ারে আমার বাঘনখ
আমার বাঘনখ
ডোঙা নিয়ে ছুটে যায় মাঝিমাল্লা, কঠিন কবজিতে লগি
খালুই ও খাপলা ওড়ে
উড়ে আসে জোলাদের রঙের গামলা

উড়নচৌকির মতো ছুটে আসে চ্যাগার ও দরমার বেড়া
তখন বাতাস চিরে ভেসে আসে দূর-প্রান্তের কিশোর-কিশোরীর কলহাস
তখন সুতো ছাড়তে ছাড়তে আকাশ নেমে আসে মাটিতে
তখন সূর্যের দাঁত শিলাবৃষ্টি হয়ে ঝমঝম গলে পড়ে
যেমন ফটাস ফুটুস টিয়ারগ্যাসের সেল সেইভাবে
দুমড়েমুচড়ে ধুলোয় সব ঢেকে দেয় সেইভাবে
সমস্ত মানুষ ও গোরু-বাছুর হুড়দুড়
কেঁপে ওঠে বনবাদাড় ও কালভার্ট
এইবার পৃথিবীর মুখ রাখো হে
সে তখন ছুটে যায় ভাঁড়ারে আমার বাঘনখ
আমার বাঘনখ
তখন ঝাউবন টপকে সমুদ্র শহরে ঢুকে যায়
তখন টুপটাপ ঝুলে পড়ে আদিম ব্রিজ ও মহান বিশ্ববিদ্যালয়
বিশ্বের কবিকুল ও সংসদীয় বুদ্ধিজীবীরা বয়া ধরে টালমাটাল
তখন তেজ কটাল বুকে হেঁটে থই থই অগাধ গিলে নেয়
মর্টারের খটাখট মেঘ ফুঁড়ে ঝরে পড়ে শরীর কাঁপিয়ে
কারা যেন ঢোল সহরত করে এ-পাড়া সে-পাড়া ঘুরে ঘোষণা করে
পৃথিবীর বয়স পৃথিবীর অবস্থা ও গত্যন্তর
তখন চাঁদ কাটাঘুড়ির মতো শূন্যতায় ভেসে যায়
বাতাস ফাঁপায় বাষ্প ও তেজস্ক্রিয়তা
ফুটফাট
বনানী ফাটে ও গড়িয়ে পড়ে
তখন ভূগোল থেকে উড়ে যায়, উড়ে আসে চিলের আকার জীবকোষ
হু-হু করে ওপরে ওঠে থার্মোমিটারের পারদ
সারি সারি ভেসে যায় প্রাচীন সম্পদ,
তখন ব্যালেরিনার মতো নৃত্যে ঘরে ঘরে সুখবর পৌঁছে দেয়
বিদ্যুৎবাহিত ডাকপিয়োন
তখন বাতাস চিরে ছুটে আসে খোল ও খঞ্জনি দূর থেকে
চারদিক থেকে ক্রলিং ... এক ... দো ... তিন ...
হোলাল্লা হুম্‌বাল্লা
তখন শব্দ রেলগাড়ির মতো হুস হুস ছুটে আসে
খিড়কি ও ম্যানহোল টপকে ঝমঝম ঝমঝম
হোলাল্লা হুম্‌বাল্লা
এক লড়াই শুরু হয়ে থইথই
এই পৃথিবীর মুখ রাখো হে মুখ রাখো হে
সেই লোকটিও ছুটে যায় ভাঁড়ারে আমার বাঘনখ
আমার বাঘনখ।

—ঝড় : সত্তর দশক

সমগ্র কবিতাটি যেন সত্তর দশকের একটা নিখুঁত চিত্রনাট্য। ক্যানভাস। এই ক্যানভাসে দেখলাম কবিরও দ্রোহ। 'বাঘনখ'।

লেখার শুরুতে 'মৃৎশকট' কাব্যগ্রন্থের প্রবেশক গদ্যটির কিছুটা অংশ আমরা পাঠ করেছিলাম। সেটি পড়েই সে বয়সেও বুঝে নিতে অসুবিধে হয়নি, আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে আরো আশ্চর্য কিছু। আশ্চর্য সব কবিতা। 'কালক্রম ও প্রতিধ্বনি'র ক্যানভাস ছিল ছোট, কিন্তু 'মৃৎশকটে'র ক্যানভাস অনেক বড়। বিরাট। আবহমান সময় ও বিরাটকে স্পর্শ করতে চায় এ বইয়ের কবিতাগুলি। কবিতাগুলি যেন এক একটি শ্লোক। শ্লোকই তো। প্রচলিত ছন্দে লেখা নয় ঠিকই কিন্তু এইসব কবিতাগুলি অনশ্বরকে ধারণ করতে চায়। কিছু শ্লোক আমরা পড়ব ঠিকই তবে তার আগে বইয়ের শুরুতে তিনটি স্তবকে বিভক্ত যে বন্দনাগান আছে, সেটি পড়ে নেব।

প্রণাম করি এই শূন্য রাত্রিকে, বন্দনা করি দিবালোক
প্রণাম করি জীব জন্তু জানোয়ার, মানুষ ও ভাগাড়ের কৃমিদের
যা রাখে তপ্ত মাটির রক্ত, সেসব রিপু, ক্ষমা, অবিদ্যার
আলো ও আঁধারের শ্মশান, প্রিয় নারী, আঁজলা ভরা মধু কিম্বা বিষ

প্রণাম করি শস্যবিদ্ধ মাটি আর, পাহাড় জলরেখা বহমান
ভূত ও অধিভূত রহস্য কাম বীজ, ব্যোম ও বিজ্ঞান আশীর্ষ
বন্দনা করি শত্রু ও মিত্রকে, শীতল ও উষ্ণ স্নায়ুর তাপ
করুণ ও অকরুণ তরঙ্গধৌত সৌরঝড়, জৈব রসায়ন

প্রণাম করি আলম্ব ইতিহাস, যুদ্ধ, জরায়ু ও উন্মেষ
ভ্রম ও সচেতন সঞ্চরণশীল ধ্বংস, অপরূপ নির্মাণ
ত্যাগ ও রতিসুখ, কিংবদন্তী ও মৌল সংগীত, শব্দদ্রুম
প্রণাম করি যা আমাকে গঠন করে, হত্যা করে প্রত্যহই

—বিভাব কবিতা

এই অংশটি থেকেই আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না, কী বিপুলকে কবিতায় ধরতে চাইছেন তিনি। তাঁর কাছে জীবজন্তু জানোয়ার এমনকি ভাগাড়ের কৃমিও সমান গুরুত্বপূর্ণ, প্রত্যেকের অস্তিত্বকে তিনি শুধু স্বীকার করছেন না, প্রণামও করছেন। আসলে বিপুল জগতে ছড়িয়ে থাকা সমস্ত প্রাণ এবং অপ্রাণের ভিতর নিজেকে দেখতে পাচ্ছেন তিনি, কারণ তিনি দাঁড়িয়ে আছেন বিশাল এক সময়ের মাঝে। কীভাবে? আসুন, দেখি:

৯২

এ তার দুঃখ নয়, এ তার শোক নয়, এ তার ভালোবাসা নয়
সে দাঁড়িয়ে আছে এক বিশাল সময়ের মাঝখানে, হাতে পেটানো ঘণ্টা
ঠিক সময়মতো সে একটি করে শব্দ তোলে, শীতল আড়াল থেকে
বুনো শুয়োরের মতো সে তার কাজ করে, তাকে কালপুরুষও বলা চলে

একটি বিরাট তারা লাটিমের মতো তার মাথায় ঘোরে
সেই কেবল জানে মানুষের মাংস দিয়ে গড়া এই পৃথিবীর চামড়া
পুড়ে যায়, পুড়ে যায়, চিনচিন করে সিনার ভিতর রক্ত বয়
আর ঘন অন্ধকার থেকে শব্দ শব্দ করে, শব্দ শব্দ তোলে, শব্দ নাচে

এ তার দুঃখ নয়, এ তার শোক নয়, এ তার ভালোবাসা নয়,
এই বিরাট ভূগোল, বিশাল মানুষের স্রোতের উচ্ছ্বাস
কঠিন ইতিহাস ও তার ধ্বংসস্তূপে একটি মমির মতো দাঁড়িয়ে
মানুষের চোখের জল ও রক্তে গড়ে ওঠে পৃথিবীর স্নায়ু কোষ ফুসফুস
সে দাঁড়িয়ে আছে প্রত্যেকটা নরমুণ্ড স্পর্শ করে
একটি বিশাল পায়ের নিচে উত্তপ্ত ও উজ্জ্বল দিন ও রাতগুলি
ফুটে ওঠে, তীব্র প্রশ্বাসের মতো তিরতির করে বয়ে যায়, হাতের চেটোয়
একটি নতুন যুগ ও জীবনপ্রণালী একটি নতুন তারার মতো আকাশে
ভেসে আসে
আর হৃদ্‌পিণ্ড-ফাটানো ইথারহীনতা ভরাট হয়, বিস্রস্ত হয়

স্পর্শকাতর পৃথিবীর চামড়ার ওপর দাঁড়িয়ে আছে দু'টি বিশাল পা
ঝুলে আছে দু'টি বিশাল হাত, শব্দের মধ্যে নক্ষত্রসমূহ ছটফট করে
সাড়ে চারশ' কোটি বৎসরের জীবাশ্ম এই পৃথিবী
জীবাশ্ম এই পৃথিবী, ওঁ, জীবাশ্ম এই পৃথিবী

একবছর, দুবছর নয় কবির চেতনায় ধরা আছে সাড়ে চারশো কোটি বৎসর। এই যে বিপুল সময়, বিরাট পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র, অতীত এবং বর্তমান— এসবেরই কবিতাই 'মৃৎশকট'। শকটটি মাটিনির্মিত ঠিকই, তা মাটি ছুঁয়েও আছে কিন্তু এ এক বিরাট ক্যানভাস। এ ক্যানভাসের পরিধি নির্ণয় করতে চাওয়াটা এক ধরনের মূর্খামি। তা না করে, বরং আসুন, আমরা সরাসরি এই ক্যানভাসের কয়েকটা তুলির আঁচড়কে স্পর্শ করি। পাঠ করি।

১৭
এই দিলাম মাটি, তুমি একে মূর্ত করো, তোমার শিল্প জাগ্রত করো
এই দিলাম অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম,
এই ভূতজগৎ
এই রিপু
যা থাকে দেবতাদের, যা আছে অনন্ত স্রোতে, ছায়ালোকময়
৪৪
গান করো সব এই মাটির আর এই আকাশের
গান করো ঐ সূর্যের
গান করো সব সমুদ্রের আর পাহাড়ের আর
গাঢ় নিতম্ব শস্যমুখর খামারের

গান করো সব ইঞ্জিন আর জাহাজের
গান করো সব শিল্পের

৭২
শান্ত হও, শান্ত হও
আমাদের এই ক্রমদ্রবমান শরীরে ফুটে উঠছে মণিপদ্ম
এই আমি শিলীভূত হয়ে পড়ে আছি প্রাচীন ফারাও
আমাদের শরীরের ওপর জমেছে সবুজ ছত্রাক ব্যাকটেরিয়া

ঘাস ও সভ্যতা
আমরা পরিবর্তিত হয়েছি শিলায় পরিবর্তিত হয়েছি ইতিহাসে

পরিবর্তিত হয়েছি সংস্কারে
এক অস্তিত্ব থেকে আর এক অস্তিত্বের মধ্যে এক ধ্বনি থেকে

আর এক ধ্বনিতে
স্মরণাতীত প্রতিক্রিয়ার মধ্যে গড়ে উঠেছি বিভিন্ন প্রতীকে
রূপান্তর, চেতনারও অতীত ক্রমবিবর্তন, এই মুহূর্তে ভেঙে

পুনরায় আর এক মানুষ

৭৬
আমি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ও রাজা, ভাগাড়ের ডোম
কোনারকের মিথুনচিত্র, উপনিষদের মন্ত্র
আমি বৃক্ষের সামনে বৃক্ষেরই মতো, সমুদ্রের সামনে সমুদ্র
উর্বশীর গর্ভফুল, কঙ্কাল, যজাতির রেতঃ
সৃষ্টি ও ধ্বংসের বিন্দুতে হঠাৎ বিদ্যুৎ,
এক কোটি বছর ধরে ঠেলে এনেছি আজকের প্রচ্ছদ,
মেঘ, বায়ু, ঘনঘোর জ্যোৎস্না ও অন্ধকার
উল্লাস, অশ্রু, যৌনকীট
বিশাল সংগ্রাম

'মৃৎশকটে' আমরা পেয়েছি বিরাটকে, বিরাটের আলো ও আঁধার, কিন্তু 'মানুষের মূর্তি'তে আমরা দেখব আবার সেই প্রান্তিক মানুষকে। অপর। যেভাবে 'কালক্রম ও প্রতিধ্বনি'তে দেখেছিলাম ঠিক সেভাবে নয়। এখানে প্রান্তিক মানুষের অসহায়তার থেকেও বেশি দেখব তাঁর জীবনের প্রতি গভীর অভিনিবেশ। যাপন। গৌরববোধ। 'কালক্রম ও প্রতিধ্বনি'র মানুষ এখানে কিছুটা পরিশীলিত। সংকেতময়। এবং আরও গভীর বোধের

আলোয় উজ্জ্বল। 'প্রতীক্ষা' কবিতাটি পড়া যাক। আসুন, পড়ি।

সন্ধেয় আমি আর মা লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে থাকি
পথের বাঁকে
এখন ঘরে আসার সময়
এখন সমস্ত বাইরের ছড়ানো জগৎ যেন গুটিয়ে আসে ঘরের দিকে
আমি এবং মা লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে থাকি বাবার প্রতীক্ষায়
ঘরামিকাকা ফিরে আসেন, গাড়োয়ান পিসেমশায় ফিরে আসেন
পাঁউরুটি হাতে ফিরে আসেন মিস্ত্রিদাদু
এবং মোষগুলিও ফিরে আসে, সন্ধে সন্ধের ভিতরে ডুবতে থাকে
শোনা যায় দরগাতলার সান্ধ্য আজান
একসময় পিঠে একটা বোঁচকা নিয়ে বাবার ফিরে আসা বোঝা যায়
আর মা তৎক্ষণাৎ বলেন—
ঐ তো, ঐ তো উনি আসছেন, দেখ ঐ তো উনি

—প্রতীক্ষা

প্রতীক্ষা কোন স্তরে পৌঁছালে, ভাবি, এরকম কবিতা লেখা যায়! প্রান্তিক মানুষ। অভাব নিত্যসঙ্গী। পাড়া প্রতিবেশি যাঁরা রয়েছেন তাঁরাও প্রান্তিক। ঘরামিকাকা। গাড়োয়ান পিসেমশায়। মিস্ত্রিদাদু। এঁরা সবাই কাজ শেষে বাড়ি ফেরেন। 'সন্ধে সন্ধের ভিতরে ডুবতে থাকে'। এরকম সময় 'আমি আর মা লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে থাকি'। কেন? কারণ, শুধু বাবা ফিরছেন, এই আনন্দে নয়, বাবা আসা মানে অন্নের সংস্থানও বটে। তাই তো আনন্দের সঙ্গে 'মা তৎক্ষণাৎ বলেন/ঐ তো, ঐ তো উনি আসছেন, দেখ ঐ তো উনি'। তবে এ বইয়ে যে প্রেম নেই, তা বলা যাবে না। এ প্রসঙ্গে আমরা 'গল্প' কবিতাটি পাঠ করতে পারি।

দশটার ভোঁ বাজতেই
নীল রঙের প্যান্ট জামা পরে রেলের খালাসি— গোপেশ্বর কাকা, সুদাম দাদু
বেরিয়ে যান কাজে, হাতে টিফিনকৌটো, কপালে চন্দনের ফোঁটা
আমাদের কলোনির ব্যস্ততা কমে আসে ক্রমশ, সংসারের কাজ শেষ করে
মা-মাসিরা দুপুরে একটানা গল্প করতে বসেন,
চাল থেকে কাঁকর বাছেন আর গল্প করেন
ছেঁড়া ফ্রক সেলাই করেন আর গল্প করেন
কয়লাগুঁড়োর গুল দেন আর গল্প করেন
তাঁদের গল্প শেষ হয় না কোনোদিন
গল্প করতে করতে তাঁদের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে
জীবনের খুঁটিনাটি বর্ণনা, সুখস্মৃতি, আলাপ-বিলাপ
শীতে রোদে পিঠ দিয়ে, গরমে বুকের কাপড় খুলে দিয়ে
বেঁচে থাকাকে তাঁরা অল্প অল্প করে তুলে আনেন তাঁদের গল্পে
আর খাপরার ঘরের মাটির দাওয়ায়

আমি আর গোপেশ শুয়ে থাকি, মাঝখানে শুয়ে থাকে নীলু
গোপেশের বোন নীলু

—গল্প

এ কবিতাটিতেও রয়েছে প্রান্তিক মানুষেরা। রেলের খালাসি— গোপেশ্বর কাকা এবং সুদাম দাদু। কলোনির মাসিরা। মা। এঁরা সবাই অকিঞ্চিৎকর কাজ করেন কিন্তু কোনো গ্লানি নেই তাঁদের মনে। তাই হয়ত কাজ করার পাশাপাশি তাঁরা গল্পও করেন। কেমন গল্প? জীবনের 'খুঁটিনাটি বর্ণনা, সুখস্মৃতি, আলাপ-বিলাপ'। কীভাবে গল্প করেন তাঁরা, তারও বিবরণ রয়েছে। 'শীতে রোদে পিঠ দিয়ে, গরমে বুকের কাপড় খুলে দিয়ে/বেঁচে থাকাকে তাঁরা অল্প অল্প করে তুলে আনেন তাঁদের গল্পে'। আর তিনি? 'খাপরার মাটির দাওয়ায়/আমি আর গোপেশ শুয়ে থাকি, মাঝখানে শুয়ে থাকে নীলু'। কে নীলু? বন্ধু 'গোপেশের বোন নীলু'। কবিতাটি এখানেই শেষ। আর কিছু নেই। কিন্তু কবিতাটি শুরু সম্ভবত এখান থেকেই। আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না, এই 'আমি'র মন পড়ে রয়েছে নীলুতেই। এইরকম প্রচ্ছন্ন প্রেমের ইশারা যে এ বইয়ে আরও রয়েছে, তা বলা বাহুল্য।

তবে প্রেম থাকবে আর যৌনতা থাকবে না, তা তো হতে পারে না। মানুষ, তিনি যদি প্রান্তিকও হন, তাহলেও তাঁর যৌনতা থাকবেই। থাকেও। কীভাবে, আসুন দেখি।

ঐ যুবতীর মুখ আজকে আমি দেখতে পাচ্ছি, ভারি চমৎকার
তার শরীরে নেমে মানুষেরা জলপান করে, তৃপ্তি পায়, কিন্তু কখনও কখনও
হঠাৎ হারিয়ে যায় যদি, বালির গভীরে, কোথায় খুঁজব তাকে?

পিপাসা, কেবল পিপাসা বেড়ে যায়—

—ফল্গু

এ হল পিপাসার কবিতা। কিন্তু পিপাসা না মেটানোর জন্য আক্ষেপের কথাও দেবদাস আচার্য লিখেছেন। কেমন সেই লেখা? আসুন, পড়ি:

একদিন এক যুবতী স্বপ্ন দেখে ছুটে এসেছিল আমাকে কিছু বলার জন্যে
তার শরীরে ছিল শিহরন আর চোখে ছিল বর্শার ধার, আমি তার
কিছুই বুঝিনি তখন। এই তো সামান্য গল্প,
এই গল্পই আমাকে সারা জীবন বলে যেতে হবে
কেউ শোনে তো ভালোই, নইলে মাঠে-ঘাটে যে-কোনো একলা সময়ে
এই গল্পই করব। রাখালদের বলব গান বাঁধতে আর গ্রাম্য উপকথার মধ্যে
এই গল্পই চালিয়ে দেব। কোনো গম্ভীর পুকুর দেখলে নাম দেব স্বপ্নের পুকুর—
কোনো বাউলের শাগরেদ হয়ে জনপদে এই গল্পই গেয়ে বেড়াব
গাইতে গাইতে দু-কশি বেয়ে ঝরবে আঠা, পোড়াকাঠ হয়ে যাবে শরীর

—উৎস

কবিতাটিতে, বোঝাই যায়, এক যুবতী, যার শরীরে ছিল শিহরন, সে এসেছিল। কিন্তু

ওই পর্যন্তই। কবি আর বেশিদূর অগ্রসর হননি। হয়ত হওয়ার মতো তাঁর সময় ছিল না। তিনি জীবনসংগ্রামে এতটাই ব্যস্ত ছিলেন যে কোনোদিকে তাকানোর ফুরসৎ পাননি। কিন্তু আজ? এই সামান্য গল্পই, তিনি বুঝছেন, তাঁকে সারা জীবন বলে যেতে হবে। আর এভাবেই 'দুকষ বেয়ে ঝরবে আঠা, পোড়াকাঠ হয়ে যাবে শরীর'।

শরীর যখন আছে, মানুষের শরীর, তখন প্রেম থাকলেও, তারও যে মৃত্যু হবে, সেকথাও তো সত্য। সেই সত্য কথাটি অত্যন্ত সহজ এবং গভীরভাবে 'ইচ্ছে' কবিতাটিতে বলেছেন দেবদাস আচার্য।

দীর্ঘদিন হেঁটে যাব, দীর্ঘ দীর্ঘ দিন
পাশাপাশি
মানুষের হেমন্তে, মানুষের বসন্তে ও শীতে
দীর্ঘ, দীর্ঘদিন পাশাপাশি শুয়ে থাকব, চুপচাপ
এক শান্ত তন্দ্রার মধ্যে
আমাদের ওপর ঝরে পড়বে হালকা কুয়াশা
পৃথিবীর আলোয় ঝলমল করবে আমাদের শরীর
তারপর মাটি এসে একটু একটু করে খেয়ে নেবে আমাদের

—ইচ্ছে

'মানুষের মূর্তি'তে যৌথতার কথা যেমন আছে, পাশাপাশি তেমনই রয়েছে একক মানুষের কথা। নিঃসঙ্গ মানুষ। কিন্তু দেবদাস আচার্যর নিঃসঙ্গতাও বিষণ্ণতা তৈরি করে না। নিঃসঙ্গতার মাঝেও তিনি টের পান তিনি একা এবং অপরূপ। 'রোজনামচা' কবিতাটি তেমনই।

একটু কষ্ট আছে, সামান্য যৌন উত্তেজনা আছে, অল্প খিদে আছে
আর কিছু নেই
যৌথ, সামাজিক, ভাসমান কিছু নড়াচড়া আছে
আর কিছু নেই
চারিদিকে সাদা, শীত, ভাঙা আসবাব পড়ে আছে
কিছু আবছা চিঠি পড়ে আছে
আর কিছু নেই
শূন্যতা ঘুরছে তার থেকেও বড়ো শূন্যতার মধ্যে, একা, হালকা অপরূপ
আর কিছু নেই

—রোজনামচা

এই যে একক মানুষ, তিনি অবশ্য যে সবসময় একাকীত্ব উপভোগ করেন, তা হয়ত নয়। একক মানুষেরও থাকে ভয়। এই ভয় নানাদিক থেকে আসতে পারে। বন্ধুদের কাছ থেকে। আবার শত্রুদের কাছ থেকেও। কে যে কখন চোরাপথে আক্রমণ করবে তা বোঝা মুশকিল। আক্রমণ নেমে না এলেও ওই ভয় সবসময় একক মানুষকে তাড়া করে। ভয়ের ভিতর কীভাবে কেটে যায় একটা জীবন, তা আমরা দেখব 'ড্যাগার' কবিতায়।

একটা ড্যাগার সবসময়ই তার বুকের ওপর ঝুলে থাকে
ঘুমের মধ্যে, অফিসে যাওয়ার পথে, ক্যাশবই লেখার সময়
লোকজনের মধ্যে অথবা একা, যেখানেই সে থাকে
একটা ড্যাগারের ছায়া তার পিছনে অথবা সামনে দোলে
ফলত তার ব্যক্তিগত সুখ-শান্তি নষ্ট হয়, এমনকী
রতিক্রিয়া, সন্তানকে আদর করা বা ছায়াছবি দেখার সময়ও
ঐ ড্যাগারের অত্যাচার অনুভব করে, কোথায় এই অত্যাচারের শুরু
কোথায় তার শেষ
কিছুই সে বুঝতে পারে না, সুতরাং
সবসময়ই তাকে খুব তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হয়, এবং
সব কাজই হয়ে যায় খাপছাড়া, এলোমেলো, আড়ষ্ট
আর তা ছাড়া ব্যাপারটাও হয়ে উঠেছে তার গা সওয়া, কেবল
চাপা উত্তেজনা আর ভয়ে সে ভিতরে ভিতরে দৌড়ুতে থাকে, দৌড়ুতেই থাকে
দৌড়ুতে দৌড়ুতেই সে যাবতীয় সাংসারিক কাজ সেরে ফেলে
সহবাস, সন্তানকে আদর করা— সবই

—ড্যাগার

এইরকম আশ্চর্য সব কবিতা রয়েছে 'মানুষের মূর্তি' কাব্যগ্রন্থে। বস্তুত প্রতিটি কবিতাই আলাদা উল্লেখের ও আলোচনার দাবি রাখে। কিন্তু পরিসরের কারণে থামতে হচ্ছে। থামবও। থামার আগে আমরা আরো একটি কবিতা পাঠ করব। বইয়ের শেষ কবিতা।

সব মিলিয়ে একজন প্রান্তিক মানুষ, তিনি কেমন, কেমন তার চেহারা, তা জানতে আমাদের এই কবিতাটি পাঠ করতেই হবে।

আপনি বলছেন আমি রোদে পোড়া কাঠ?
আমি জানি, আমি জানি
কতখানি ভদ্র আর কতখানি সহ্যশীল হওয়া উচিত তা আমি জানি
আমি জানি, আমাকে ভাঙতে হবে ঐ ভয় ও ঐতিহ্য
যা অনবরত আমাকে বিচ্যুত করছে
এবং আমি বিষাক্ত শব্দগুলি তৈরি করছি
যা আমি প্রাণপণ ছুড়ে দিতে চাই সবরকম ঘৃণার বিরুদ্ধে
আমার গরম নিঃশ্বাসে গলতে থাকবে মানুষের পাপ
আমার চর্বিতে জ্বলে উঠবে মানুষের শেষ বিচারশক্তি
আবার একদিন আমি আপনার সামনেই দাঁড়াব, নিশ্চয়ই দাঁড়াব
তখন দেখবেন কত সুগঠিত হতে পারে মানুষ

—মানুষের মূর্তি

'মানুষের মূর্তি'রই সম্ভবত আরো সম্প্রসারিত রূপ 'ঠুঁটো জগন্নাথ'। এই বইয়ের প্রতিটি কবিতাতেও রয়েছে প্রান্তিক আমির গৌরবের কথা। রয়েছে গ্লানির কথাও। কিন্তু শুধু কি এই?

এ বইয়ের কয়েকটি কবিতায় পাব সন্তানের কথাও। সন্তান। 'ধর্ম' কবিতাটি, আসুন, পাঠ করি।

খুঁটে খুঁটে দানা খাই, রোদে হাঁটি
নিম্নবিত্ত মাথার কামড়ে কষ্ট পাই কিছু
বড়ো দীর্ঘ দিন ভেসে আছি
ভাষাহীন বিদ্রোহে দগ্ধ হই
কাকে খিস্তি দেব আমি, কার দিকে তুলে ধরব তর্জনী, ভাবি
নিজের ভিতরে তাকালে ভয় হয় খুব
সারারাত বৃষ্টি পড়ে, থুম হয়ে থাকে মেঘ
নিচু খাটো এই ঘরগুলোর মধ্যে শতাব্দী ঘুমিয়ে আছে, মনে হয়
রক্তে বয়ে যায় টুকরো টুকরো দীর্ঘশ্বাস, তবু
আমার সন্তান বড়ো হবে
যাজকের সান্ত্বনার মতো বার বার
এই কথা ভাবতে ভালো লাগে

—ধর্ম

দৈনন্দিন জীবনে অনেক গ্লানি, তবু তার মধ্যে সান্ত্বনা হয়ে এসেছে সন্তান। সে তাঁর মতো হবে না, প্রকৃতই বড় হবে, এই সান্ত্বনা— এও কি খুব কম?

সন্তানের জন্য ভাবনা, এ নিয়ে আমরা আরো একটা কবিতা পাঠ করব। 'মোহ'।

ভাবি, আমার স্ত্রীর কথা
ভাবি, সন্তানের কথা
প্রতিবেশীদের কথাও ভাবি,

নিশানের মতো আছি খাড়া, জেনো
বাতাসে কেঁপেছি, রোদে উষ্ণ হয়েছি
দেখেছি অনেক লোক আজও স্থির চোখে
মুহূর্তের জন্যেও আত্মার সঙ্গে কথা বলে

বন্ধুরা, তোমরাও
ভেবো, আমার স্ত্রীর কথা
ভেবো, সন্তানের কথা, ভেবো

—মোহ

দেবদাস আচার্যর অনেক ধরনের কবিতাই আমরা পাঠ করলাম। কিন্তু প্রান্তিক মানুষ, যিনি নিজে কবি, সেরকম ভাবনা নিয়ে কি কোনো কবিতা আলাদাভাবে পড়েছি? সম্ভবত নয়। এবার যে কবিতাটি পাঠ করব, সেখানে আমরা দেখব একজন কবিকে। কবির ইমাজিনেশন। কষ্টও।

একদিন তবু
আস্তে আস্তে ঢুকে যাই

যেন কেউ হাত ধরে নিয়ে যায়
গভীর অতলে

ফিকে নীল, হলুদাভ সবুজ জল
দু-একটি সুদীর্ঘ ফার্ন খাড়ি
প্রবালকীটের খেলা
নির্ভার ভেসে থাকি
আঃ, কী আরাম স্বপ্নচারিতায়।

বেশিক্ষণ থাকতে পারি না
শ্বাসকষ্ট হয়, ভেসে উঠি

জলের প্রাণীরা জলে থাকে
ডাঙার প্রাণীরা থাকে ডাঙায়
শুধু স্বপ্নের প্রাণীরা কষ্ট পায়

—কবি

সত্যই তো তাই। ডাঙার প্রাণিরা থাকে ডাঙায় জলের প্রাণিরাও থাকে জলে শুধু স্বপ্নের সংবেদনশীল মানুষেরা, কবিরা, থাকেন কষ্টে।

এবার একটু ভিন্ন ধরনের কবিতা পড়ব। আমাদের দেশের বড় রঙ্গ হল ভোট। ভোটের সময় নেতারা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ান আর ভোট শেষ হয়ে গেলে তাঁদের আর পাত্তা পাওয়া যায় না। বড়জোর ভোটে জেতার জন্য সমর্থকদের হাতে কিছু পয়সা আসে। তা দিয়ে তাঁরা হুল্লোড় করেন। এরকমই হুল্লোড় দেখি 'একানীর নাচ' কবিতায়। আসুন, দেখি কেমন সেই নাচ।

নির্বাচন শেষ হয়ে যাওয়ার পর এই প্রথম
আমাদের বস্তিতে ঢোল বাজে
একানীর নাচ, হ্যাজাকের আলো
ডিম ডিম ঢোল আর খুচরো খেউড়, আর
লুঙিপরা মধ্যবয়স্ক লোক বিড়িতে টান দিয়ে বলে: অহোঃ বাহাঃ

নাচো রে একানী, নাচো, বাজো ঢোল
স্ত্রীর গর্ভসঞ্চার হয়েছে এই সুখে
আমিও হুল্লোড়ে যোগ দিই

সুন্দরবন ছুঁয়ে ভেসে আসছে হাওয়া
উলঝুল গ্রামের আকাশে জ্বলজ্বল করছে তারাগুলি
ঢোলের উদ্দাম শব্দ, একানীর নাচ, মাতাল হুল্লোড়

বস্তির খুপরি ঘরে স্যাঁতসেঁতে বিছানায় এপাশ-ওপাশ গড়াচ্ছে আমার বউ

বাহা রে, বাহা রে
সামনের সোমবার মন্ত্রীসভা শপথ নেবেন:
হেই বাবা মন্ত্রীসভা, মানিকপীরের পুজো দেব
গরীবের বউ যেন ভালোই ভালোই খালাস হয়

নাচো রে, একানী, নাচো—
—একানীর নাচ

একানীর নাচ তা আরো তাৎপর্যময় ও স্যাটায়ারপূর্ণ হয়ে পড়ে কবির যোগদানের কারণে। এখানে কবি নাচছেন সম্পূর্ণ অন্য একটা কারণে। কারণ, আর কিছু নয়, স্ত্রীর গর্ভসঞ্চার হয়েছে, সে বস্তির খুপরি ঘরে স্যাঁতসেঁতে বিছানায় এপাশ-ওপাশ গড়াচ্ছে। একদিকে সন্তান হওয়ার আনন্দ, অন্যদিকে স্ত্রীর প্রসবব্যথা। ঢোলের উচ্চকিত শব্দে তার কাৎরানোর শব্দ শোনা যাচ্ছে না। নাকি যাচ্ছে? এ হল প্রান্তিক মানুষের অসহায়তার কবিতা। আনন্দের কবিতা। বইটির প্রিন্টার পেজে ইংরেজিতে বইটির নাম লেখা আছে। Handicap God. সত্যিই এই মানুষটি, কবি, যিনি বাবা হতে চলেছেন তিনি তো একজন Handicap। Handicap God। ঠুঁটো জগন্নাথ।

এবার আমরা যে বইটির প্রসঙ্গে যাব, সেটি দেবদাস আচার্যর আরো একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বই। 'আচার্যর ভদ্রাসন'। বইটি ১৯৯২ সাল নাগাদ প্রকাশিত হয়। এর বছর তিনেক আগে, দেবদাস আচার্যর একটি সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, তিনি রাধানগরের পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে নগরের এক প্রান্তে একটি বাড়ি নির্মাণ করে সেখানেই থাকতে শুরু করেন। জায়গাটা ছিল তখন ঘরবাড়িশূন্য। গাছপালায় ভর্তি। জঙ্গল। কাছেই শ্মশান। ইটভাটা। এখানে বেদের দল তাঁবু টাঙিয়ে মাঝে মাঝে থাকত। ছিল না কোনো বিদ্যুৎ। এইরকম পরিবেশ তো হাজার বছর আগে বাংলায় দেখা যেত। এইরকম রহস্যময় পরিবেশে সাধনা করতেন এবং চর্যাপদ লিখতেন সাধকরা। লুইপাদ। কাহ্নপাদ। হাজার বছর আগের সেই জগৎ এবার ফিরে আসে দেবদাসের কবিতায়। নিজেকে তাঁর মনে হয় তিনি সিদ্ধাচার্য। আর নৈরাত্মমণি হল তাঁর স্ত্রী। সিদ্ধাচার্যর জীবন ও যাপন কেমন ছিল, আসুন, দেখি এই কবিতায়।

নগরের প্রান্তে সিদ্ধাচার্যের বাড়ি
খড়িয়া নদীর কূলে বাগদিপাড়া, বেদেদের তাঁবু
হাওয়ার গম্ভীর স্বর আকাশের দিকে ভেসে যায়।

জাতীয় সড়ক দিয়ে ভুটান-রাজার কনভয়
খাদ্য নিয়ে দেশে ফেরে, লরি-ড্রাইভারের শিস

শৌখিন বাসের দূর-অভিযান ঐ বাড়িটিকে
অস্থির ও চলমান করে রাখে সর্বক্ষণ, যেন
এও এক সংবেদন, এও এক চিরযাত্রাধ্বনি
সুখী গৃহকোণ আজ দিগন্তের প্রসারতা পেয়ে যায়
এত প্রসারতা, এ উন্মুক্ত আকাশ
এত রোদ, এত আলো, এত সজীবতার ভিতর
শ্রীযুক্ত আচার্য মহাশয় আজ অসহায়, যেন
তুচ্ছ এক খড়কুটো ভেসে যায় অসীমে, অনন্তনীলে, রাত্রির গভীরে
এত যে বিশাল— তার অসহ্য অস্তিত্বে হিম করে দিয়ে যায়
আচার্যর শিরদাঁড়া, যেন প্রকৃতির
হিংস্রতা লাফিয়ে লাফিয়ে নামে সারারাত
শান্ত সমতল, দূরে শ্মশানের আলো
ধিকিধিকি জ্বলে, জাতীয় সড়কে ছোটে আলোর মিছিল।

শ্রীআচার্য গৃহী, তার ক্ষুদ্র সংসার
যে মহিলা আগলে রাখে সেও হতবাক, তাহলে কি
প্রকৃতির বিশালতাই অতিপ্রাকৃতিক?
কত যুগ ধরে ক্ষুদ্র হতে হতে আজ
এত ক্ষুদ্র হয়ে গেছে শ্রীআচার্য?
আচার্যর অস্তিত্ব চেটে চেটে খায় ঐ বাড়ি, ঐ অতিপ্রাকৃতিক
বেদুইন বাঁশি, বাগদিপাড়ার ঢোল, রাতের আকাশ, রাজপথ

—আচার্যর ভদ্রাসন

বোঝাই যায়, গভীর উপলব্ধিই এ কবিতার অবলম্বন। এজন্যই হয়ত তিনি নিজেকে সিদ্ধাচার্য বলছেন। জনমানবশূন্য এই জায়গায় তিনি যে প্রায় ধ্যানের জগতে চলে যান, সেটা টের পাই, এ বইয়ের কবিতাগুলি পড়ে। 'সিদ্ধাচার্যের ধ্যান' সেরকমই একটি কবিতা। পড়া যাক এই তন্ময় কবিতাটি;

কোনো রহস্যের মধ্যে আর
জড়াবে না সিদ্ধাচার্য, তার
শরীরে ধূপের গন্ধ, মননে নির্ভার
আনন্দবাতাস।

জন্মেছিল, তাই
কৃতকর্মের কিছু দায়
থেকে গেছে তার।

অংশত, খণ্ডিত, তবু চেষ্টা ছিল তার
নিজস্ব ভাষার কাঠামো, মেধা, অন্তর্চোখ, স্নায়ুরসায়নে

রসাস্বাদনের।

এ জীবন আত্মমোচনের
এ জীবন পাপক্ষালনের
এ জীবন শুদ্ধিকরণের
আর কিছু নয়।

সব সমাধানসূত্র অঙ্কে মেলে না
তাই এই ধ্যান।
আর তারপর?
ধ্যানেও মেলে না।

আচার্যের চৈতন্যে ফোটে শতদল
—সিদ্ধাচার্যের ধ্যান

হ্যাঁ, বুদ্ধি নয়, কবিতাগুলি চৈতন্য দিয়ে লেখা। তাই তিনি লিখতে পারেন 'আচার্যের চৈতন্যে ফোটে শতদল' এর মতো পঙ্‌ক্তি। আরেকটি কবিতায়, 'শ্মশান-অগ্নি', সেখানে লেখেন 'সিদ্ধাচার্য খঞ্জনি বাজান/তাঁর দেহ/শ্মশান-অগ্নি হয়ে জ্বলে ঐ নদীর ওপর'। তাঁর বিশ্বাস 'এ দেহ শ্মশানে গেলে ভস্মও মিশে যাবে ও আলোয়'। এ বইয়ের কবিতাগুলো, তাই আরেক অর্থে আলোর কবিতা। কেমন সেই 'আলো', তা জানতে আমরা পড়ব আরেকটি কবিতা। 'ডোম'। আসুন, কবিতাটি পাঠ করি।

সবুজ, সুদূর সবুজ,
নীল, অখণ্ড, গভীর
পাদপীঠে নদী
এইখানে বাস করেন এক
ব্রাত্য নাগরিক
ঈশ্বরের কৃপাহীন, প্রাকৃত, নাস্তিক
শূন্য অনুবাদ করেন তিনি।

রাতে ফোটে অনিমেষ পদ্মলোচন তাঁর
শূন্যের সাগরে।

কোনো ভাষা নেই তাঁর, কোনো বাণী নেই
কোনো শোক নেই তাঁর, কোনো প্রেম নেই,

আত্মক্ষরণ করে তিনি
মধুপান করেন।

শ্মশানের আলো এসে তাঁর মুখে পড়ে।

—ডোম

আচার্যর ভদ্রাসন কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি কি আধ্যাত্মিক কবিতা? আধ্যাত্মিকতা বলতে যা বোঝায়, বুঝিও, তেমন কিন্তু নয় এই কবিতাগুলি। তবে কেউ কেউ এই কবিতাগুলিকে, গভীর উপলব্ধিজাত হওয়ায় আধ্যাত্মিক কবিতা হিসেবে চিহ্নিত করতে চান। করেনও। কিন্তু এগুলো, আমার ধারণা, ঠিক সেই অর্থে আধ্যাত্মিক কবিতা নয়।

তাহলে সিদ্ধাচার্য? তিনি কে? তিনি কি কোনো আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ? সিদ্ধাচার্য আসলে একজন সাধক। মানবতার সাধক। ভাষার সাধক। আর তাঁর স্ত্রী? তিনি সিদ্ধাচার্যর সাধনসঙ্গিনী। নৈরাত্মমণি। তাঁকে নিয়ে কাম ও সৌন্দর্যের সাধনায় রত তিনি। তাঁর এই সৌন্দর্যসাধনার কথাই দেখব এ বইয়ের প্রতিটি কবিতায়। বাক্যে। আসুন, এই কবিতাটি পুরোটাই পাঠ করি:

নীল শঙ্খ স্তনদুটি ভেসে আছে সরস্বতীর
শূন্য আকাশে
সমস্ত আনন্দ থেকে নির্যাতিত ধ্বনি ভেসে আছে
করুণাময়ের।

অল্পবেদনের কর্মী, সরকারি অফিসের গাণনিক
সিদ্ধাচার্য হাট করে ফেরেন
পুঁটলিতে শূকর মাংস
নৈরাত্মমণি রাঁধবেন।

নৈরাত্মমণির পাক শবরগ্রামের বড়ো প্রিয়
আজ ভোজ, জাতীয় সড়কে বাজে দুন্দুভি
শবরগ্রামের উৎসব
শাপমুক্ত হবেন কি সিদ্ধাচার্য আজ?
আর জন্ম নয়
নীলসরস্বতী শূন্যে ভেসে তাঁর কাম
পাপড়িতে ধরেন।

বাষ্প ওঠে, বুদ্‌বুদ ওঠে
সিদ্ধাচার্যের আত্ম নৈরাত্মমণি
মাটির হাড়িতে ফেলে শরীরের তাপে সিদ্ধ করেন।

—সহবাস

এমনিতে দেবদাস আচার্যর কবিতায় বাহুল্য প্রথম থেকেই প্রায় নেই, নেই নাটকীয় উচ্চারণ, ঘটনার ঘনঘটা। তবে 'তিলকমাটি' থেকে আমরা আরো একটা পরিবর্তন লক্ষ করব। এই

বইয়ে নেই না পাওয়ার ক্ষোভ। হতাশা। নেই অতিরিক্ত একটা অক্ষরও। কবি এ বই থেকে আরো নির্ভার হতে চাইছেন। যা কিছু কবিতা নয়, তাকে পুরোপুরি বর্জন করতে চাইছেন, করছেনও। একসময় দেবদাস আচার্য লিখেছিলেন কবিতা হচ্ছে অন্তস্তল থেকে উঠে আসা আলো। এই আলোই, শুধুমাত্র এই আলোই দেবদাস আচার্যর বর্তমান সময়ের কবিতার অবলম্বন। দেখুন, কবিতা কীভাবে বাহুল্যবর্জিত হচ্ছে।

ঢলঢলে পাতার ভিতর
সূর্যোদয় রঙের
পঞ্চমুখী জবা
একটাই
একটা বলেই ছিঁড়ে নিতে
হাত কাঁপে

—এক ও পরম ১

কী গভীর সংবেদন থাকলে এ ধরনের কবিতা লেখা সম্ভব। এই সংবেদন ছড়িয়ে আছে 'তিলকমাটি'-র পাতায় পাতায়। আরো একটি কবিতা, আসুন, পাঠ করি।

এসো, গোল হয়ে বসি
মোমবাতি আলো নিভু-নিভু
যে যার গল্পগুলি এবার শেষ করি
সময় আর দিবালোক চঞ্চল
দ্রুত সরে সরে যায়, পালা বদল করে
ততোধিক দ্রুততায় আমাদের স্বপ্নে রং লাগাতে হবে
এসো, আলো থাকতে থাকতে
আমাদের কল্পনার গায়ে
লতা-পাতা জড়িয়ে দিই
নদীর ঢেউ জড়িয়ে দিই

—দেরি কোরো নাম

শুধু ব্যক্তি আমি বলে যে বিচ্ছিন্নভাবে কোনো সত্তা থাকে না, না চাইলেও যে সত্তার সঙ্গে জড়ো হয় আরো অনেক কিছু, তার কথা অসামান্য ভাবে বলেছেন এই কবিতাটিতে। 'কিছুই নেই'। আসুন, এ কবিতাটি পাঠ করি।

আমাদের নিম গাছের ডালে
একটা পাখি এসে বসল
তার পাশে
আর একটা পাখি এসে বসল
এভাবে তাদের
বসত গড়ে উঠল
নিম গাছটার ফুল এল

ফল ধরল
ডালপালা ছড়াল
এসব কোনো কিছুই ছিল না
যখন বাড়ি বানালাম
বাড়ি ঘিরে আর যা যা গড়ে উঠল
সবই কেমন
আপন ইচ্ছেয়
এল বিড়াল, কুকুর
এল ইঁদুর আরশোলা টিকটিকি
এদের কাউকেই আমি আসতে বলিনি
কিন্তু এরা এল
একটা ভাম এল
একটা চোর এল
একটা পাগল এসে কড়া নাড়ল
এসব উপদ্রব
আমি চাইনি
কিন্তু বাড়ি বানালাম বলেই
উপদ্রবও এল
আমি সামান্য একটা বাড়ি বানালাম কিন্তু তা সবিশেষ
আমার রইল না আর
ক্রমে অসামান্য হয়ে উঠল
যা কিছু বানাই
সম্ভবত তাতে
অন্য অনেকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়
বস্তুত
আমার অবিসংবাদিত একক অধিকার বলতে
কিছুই নেই
কিছুই নেই আমার একার, নেই, কিছুই নেই...

—কিছুই নেই

জাঁকজমকহীন খুব কম শব্দ দিয়ে কবিতাগুলি গড়ে উঠলেও তাতে, দেখতে পাব, রয়েছে ইমাজিনেশন। কল্পনার বিস্তার। কল্পনা কীভাবে প্রসারিত হচ্ছে তা দেখব এই কবিতাটিতেও:

এই বারান্দায়
ওই সুবিশাল গাছের ছায়া
মৃদু জ্যোৎস্না, অচঞ্চল রাত

উচ্চকিত সব শব্দ থেমে গেছে

আঙুলের মাথায় একটা জোনাকি এসে বসল
হাত লম্বা করে দিই, প্রলুব্ধ হই
আঙুলটাকে বাড়তে দিই
এবার অনেক কটা
তারপর ঝাঁক ঝাঁক
অসংখ্য তারার মতো

আমার আঙুল ওরা টেনে নিয়ে চলল
বহু দূরে বহু বহু দূরে
এখন
সবচেয়ে কাছের একটা ছায়াপথ
আমার আঙুল
—বাড়তে দিই

'তিলকমাটি'র কবিতাগুলি পাঠ করলে মনে হতে পারে জগতে গ্লানিকর বলে কিছু নেই। থাকবেই বা কেন? সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে গান। বাতাস। গাছ। গাছে গাছে ফুল। নদীজল। এইসব দৃশ্য তো অমলিন। তাই এর মাঝে বেঁচে থাকাটাই তো শুশ্রূষা। তাই, রোগ কঠিন হলেও, আমরা দেখছি, কবির ঔষধ কমিয়ে দিচ্ছেন ডা. শুভানন রায়।

ওই হারমোনিয়ামটিকে শায়িত গানের মতো মনে হয়, মনে হয়
ধুলো ঝেড়ে গলা সাধি নিভৃতে বসে,
গান সর্বত্রই শুয়ে আছে, তাকে জাগাবার ইচ্ছেটুকু
উসকে উসকে রাখি।

আকাশে আকাশ-নীল ওড়না ওড়ে
বাতাসে হাওয়ার মতো সমীরণ বয়
গাছে-গাছে, ফুলে-ফুলে, নদী মুখ দেখে নদীজলে
এসব দৃশ্য খুলে খুলে তরতাজা থাকি, দেখি
এ জগৎ সর্বক্ষণ নিজের ভিতরে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে।

ডাঃ শুভানন রায় মহাশয় বললেন
এই তো, বেশ তো আছেন, একটা ওষুধ
আজ থেকে কমিয়ে দিলাম।
—চিকিৎসা

এরপর যে কবিতাটি পাঠ করব সেটি, আমার ধারণা, একজন কবি বোধের চূড়ান্ত জায়গায় না পৌঁছালে লিখতে পারেন না। পারেন কি? আসুন, দেখি, কী বলছে কবিতাটি:

আমি যে গানটি গাইতে চেয়েছিলাম
ওই ফকির তো সেই গানটিই গাইছে
আমি একটা ছবি দেখতাম মনে মনে
কতবার আঁকতে চেয়েছি সেই ছবি
ওই তো, সেটা আঁকা হয়ে গেছে, দেখছি
এঁকেছেন কেউ না কেউ
অমন একটা বাড়ি
আমারই তো বানানোর কথা ছিল,
বাড়ি কথা বলবে,
তার ডাক থাকবে— এসো, এসো, এসো...
মন্দিরে যাকে প্রণত হতে দেখছি
তিনিও তো আমার স্তবকেই নিবেদন করছেন...

এ বড়ো ভালো কথা
কেউ না কেউ
আমার কাজগুলি সেরে রাখছেন

—ইচ্ছেপূরণ

ফকির যে গান গাইছেন তাকে নিজের গান ভাবা কিংবা চিত্রকর যে ছবি আঁকছেন সেটিকে নিজের ছবি ভাবা অর্থাৎ সবকিছুর সঙ্গে একাত্ম হওয়া, এর চেয়ে তো বড় ভাবনা আর কিছু হতে পারে না। অথচ, কী আশ্চর্য, এই গভীর দার্শনিক প্রস্থানটি তিনি রচনা করলেন কত অল্প ও সহজ কথায়। শুধু 'তিলকমাটি' নয়, 'ফটিকজল', 'যা আছে আপনারই', 'তারপর যাব', 'এই যে থাকা' কিংবা সদ্য প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'বিন্দু নয় রেখা নয়' কাব্যগ্রন্থেও আমরা লক্ষ করব এই স্বর। সহজ কথায় গভীর ভাবনা। গহন উপলব্ধি।